



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1088 - 1092

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

অথর্ববেদে উদ্ধৃত নৃত্য-গীত-বাদ্যকলা : এক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি

ড. বিপ্লব দাস

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ

কাশী-হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: biplabdas1295@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Atharva Veda,
Rig Veda,
Samaveda,
Vedic
mantras,
Vedatrayi.

Abstract

The Atharva Veda, one of the Vedas, has one of its own characteristics. Its subject matter is different from that of other Vedas. The Rig Veda gives a direct glimpse of the social situation of our culture. The main theme of the Yajurveda is ritual. The subject of the Samaveda is singing. It contains a collection of Vedic mantras sung on the occasion of sacrifices. The subject of the Atharva Veda is quite different from these three. The other three Vedas are closely related to sacrifices but the Atharva Veda does not contain mantras on sacrifices. That is why the three Vedas are sometimes referred to as 'Vedatrayi' for distinction. The Atharva Veda contains presentations of secular subjects along with Vedic subjects.

A rich art tradition can be found around the world from prehistoric times to the present day. The numerous forms of art which are scattered here and there on the earth in the form of patterns of architectural paintings and games or are established in human life in the form of instruments, dances, songs, etc. They embody the elements of joyfulness, auspiciousness and beauty. Our ancient Vedic literature has also done the work of preserving the thousands of years old great treasures of Indian art which are not preserved in the present art monuments. The Atharva Veda, the world's earliest text, is also the oldest patron of art and beauty.

Discussion

সঙ্গীত হল একটি ত্রিবেণী, যেখানে গীত-নৃত্য-বাদ্য এই তিনটির এক মধুরতর সঙ্গম রয়েছে। এই তিনটির একে অপরের সাথে অভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। যেমন - গানকে বাদ্যযন্ত্র থেকে পৃথক করা যায় না আবার নৃত্যকে গান এবং বাদ্যযন্ত্র থেকে পৃথক করা যায় না। নৃত্য হল ভাবপ্রদর্শন প্রধান এবং এই কাজটি গানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নৃত্যে মুদ্রাগুলি প্রাধান্য পায় এবং গান গৌণ। নৃত্যের পরিবেশনা তালের উপর ভিত্তি করে যেখানে মৃদঙ্গ, পোখরাজ এবং বাঁশির মতো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। গানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে এবং এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এর সাথে তারযুক্ত পুঁষির বাদ্যযন্ত্র থাকা প্রয়োজন। যেহেতু এই তিনটি শিল্প অভিন্ন, তাই পরিভাষা এবং শব্দভাণ্ডারে এই তিনটির মিল রয়েছে। সঙ্গীতরত্নাকরে, শার্ঙ্গদেব লিখেছেন -

“গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।”^১

অর্থাৎ, গান, বাদ্যযন্ত্র এবং নৃত্য সবই সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এখানে নৃত্যকে বাদ্যের অধীনস্থ বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই তিনটির আলাদা আলাদা স্থান রয়েছে।

অথর্ববেদে নৃত্যকলা : ‘নৃত্য’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ‘নৃত্য’ শব্দটি সর্বদা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিনোদন উপভোগের একটি মাধ্যম ছিল, যা মানব মনের অনুভূতি প্রকাশের একটি খুব সহজ, সরল এবং শক্তিশালী উপায়; যে কারণে প্রায় প্রতিটি সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে এর একটি সম্মানজনক স্থান রয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্যের একটি পৃথক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। মানব অতিরিক্ত প্রাণীদের মধ্যে ময়ূরের নৃত্য সর্বদা আকর্ষণীয়। সভ্যতার আদিকাল থেকেই ময়ূরের নৃত্য মানুষের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে আত্মতার সাথে দেখা হয়ে আসছে। এটি নিজেই নৃত্য শুরু করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আজকের অর্ধ-সভ্য বনবাসী জাতির নৃত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় যে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের প্রায় সকল অংশের মানুষের নিজস্ব নৃত্য ছিল। তাদের নৃত্যের বিকাশ এবং উৎপত্তি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং প্রবণতার সূচক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বৈদিক যুগে গান এবং বাজনার পাশাপাশি, নৃত্য শিল্পের প্রতি বিশেষ অভিরুচির জ্ঞান ছিল। নৃত্যশিল্পীরা তাদের পায়ে কঙ্কিনী বেঁধে জনসমক্ষে তাদের নৃত্য পরিবেশন করতেন। সোমরস পান করার পর পুরুষ ও মহিলারা দলবদ্ধভাবে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতেন, যা তৎকালীন সমাজে নৃত্যশিল্পের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সহজ ধারণা দেয়। নৃত্যশিল্পের জনপ্রিয়তা বিভিন্ন ধরনের নৃত্য যেমন দড়ি, জল, অরুণ, প্রকৃতি, ফুল এবং বসন্ত নৃত্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

অথর্ববেদেও বৈদিক যুগে নৃত্যের জনপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে হাস্যের সাথে নৃত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

“আনন্দা পোদা প্রমুদোভীমোদমুদচ্চ যে।

হসো নরিষ্ঠা নৃত্যানি শরীরমনু প্রাবিশন্।”^২

অর্থাৎ আনন্দ, হাস্য, পরিহাস, আমোদ, প্রমোদ ইত্যাদির চেষ্টা নর্তনাদির সঙ্গে মানবদেহে প্রবেশ করেছিল; যা দেখায় যে নৃত্যের সাথে হাস্যরস এবং বিনোদনের সম্মিশ্রণ ছিল।

নৃতি (নর্তনম্) শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটি নৃত্য এবং হাসির প্রমুখতা বর্ণনা করে –

“ইমে জীবা বি মূর্তৈরাববৃদ্ধাভূদ্ ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।

প্রাশ্বেগে অগাম নৃত্যে হস্যে সুবীরাসো বিদথমা বদেম।।”^৩

জীবিত ও দৃশ্যমান এই প্রাণীগুলো মৃতদেহে আচ্ছাদিত। আমরা বেঁচে আছি এবং সেই কারণেই আজ আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ কথাগুলোই কল্যাণকারী হবে। আমরা আনন্দের সাথে এগিয়ে যাব এবং উত্তম বীরদের সাথে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হব। দেবতাদের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ আমাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে।

দেশপ্রেমের আবেগপূর্ণ অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে, অথর্ববেদের পৃথ্বীসূক্তের একটি মন্ত্রে গান এবং নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে –

“যস্য্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা বৈলবাঃ।

যুধ্যন্তে যস্য্যামাক্রন্দো যস্য্যাং বদতি দুন্দুভিঃ।

সা নো ভূমিঃ প্র গুদতাং সপত্নান সপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু।।”^৪

অর্থাৎ যে দেশে মানুষ আনন্দের সাথে গান গায় এবং নৃত্য করে, যেখানে তারা জাতির সুরক্ষার জন্য সংগ্রামেও লিপ্ত থাকে, যখন শত্রুদের ক্ষতি সাধন হয় তখন দুন্দুভি বাজানো হয়। সেই ভূমি শত্রুদের তাড়িয়ে শত্রুমুক্ত করবে। এই মন্ত্রটি পৃথিবীর মানুষের নৃত্য ও গানের সুন্দর বিন্যাসকে নির্দেশ করে এবং বলে ‘যে পৃথিবীতে মানুষ নাচে এবং গান করে’। একই মন্ত্রে, ‘বৈলব’ শব্দটি রাগের মাত্রার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। একটি মন্ত্র সদনের চারপাশে নৃত্যের বর্ণনা দেয় –

“যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সায়ং গর্দভনাদিনঃ।

কুসূলা যে চ কুক্ষিলাঃ ককুভাঃ করুমাঃ স্ত্রিমাঃ।

তানোষধে ত্বং গন্ধেন বিষচীনান্ বিনাশয়।।”^৫

অর্থাৎ হে ঔষধ, তোমার সুগন্ধ দিয়ে কুসূল, কুক্ষিলা, কাকুভ এবং করুমের মতো জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করো, যাদের কণ্ঠস্বর গাধার মতো এবং কুঁড়ে ঘরের মতো, এবং যারা সন্ধ্যায় গ্রহগুলির চারপাশে নৃত্য করে। অন্য একটি মন্ত্রে দুন্দুভিকে সম্বোধন করে শত্রুদের সম্পদে থেকে নৃত্যের কথা বলা হয়েছে –

“শ্রেয়ঃ কেতো বসুজিৎ সহীয়ান্সংগ্রামজিৎ সশিতো ব্রক্ষণাসি।

অংশুনিব গ্রাবাধিষবণে অদ্রিগর্ব্যন্ দুন্দুভেধি নৃত্য বেদঃ।।”^৬

অর্থাৎ হে দুন্দুভি, ধন-সম্পদের অধিকারী, শক্তির অধিকারী, যুদ্ধজয়ী! তুমি ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমর্থিত। সোমরস পবিত্র করার সময় পাথর যেমন সোমবল্লীর উপর নাচ করে, তেমনি তুমি কামনাকারী, তুমিও তোমার শত্রুদের সম্পদের উপর নাচো।

অপর একটি মন্ত্রে ক্লীব (নপুংসক) কে নর্তক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার সাথে রোগাণুর নৃত্যের উপমা উল্লিখিত হয়েছে –

“যে কুকুন্নাঃ কুকুরভাঃ কৃতীর্দর্শানি বিব্রতি।

ক্লীবা ইব প্রনৃত্যন্তো বনে যে কুবর্তে ঘোষণং তানি তো নাশয়ামসি।।”^৭

অর্থাৎ, কুকুন্না নামক একটি রাক্ষসী রোগ, যা কুকুরের মতো শব্দ করে হিংসাত্মক কর্মের মাধ্যমে মন্দ কার্যকে স্থিতিশীল করে এবং বনে নৃত্য করতে করতে বিচরণ করে। অতএব আমরা গর্ভবতী মহিলাদের থেকে উভয় ধরনের রোগের কারণকারী রোগ-জীবাণুগুলিকে দূর করি।

এইভাবে অথর্ববেদের সূক্ষ্ম অধ্যয়ন থেকে স্পষ্ট হয় যে বৈদিকযুগে নৃত্যকলা সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল।

অথর্ববেদে সঙ্গীতকলা : সঙ্গীত সকল কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীত শিক্ষাকে অত্যন্ত পবিত্র এবং সর্বোচ্চ বলে মনে করা হয়। পদ্মপুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি নারদকে বলেছেন –

“নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।।”^৮

সামবেদেও সঙ্গীত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। সামবেদ ঋগ্বেদের মন্ত্র অনুসারে রচিত। অর্থাৎ, হোম যজ্ঞ এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানে উচ্চস্বরে উচ্চারিত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি গ্রহণ করে সামবেদ রচিত হয়েছিল। এখানে আমরা একটি সুশৃঙ্খল, স্থির ও ছন্দবদ্ধ উচ্চারণের উৎপত্তি দেখতে পাই।

বৈদিকযুগেও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে লৌকিক সমারোহে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে করা হত। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত সঙ্গীত কঠোর নিয়মে আবদ্ধ ছিল, যদিও লৌকিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত সঙ্গীতে লোকরঞ্জন উপাদান অধিক ছিল।

যেহেতু বৈদিক মন্ত্রগুলি জীবনীশক্তি এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে সমৃদ্ধ, তাই তাদের গান জাগতিক এবং পারলৌকিক কামনা পূরণের জন্য পৃথক পৃথক আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞকর্মে করা হত। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে, বেদ মন্ত্রের গানের জন্য এই ধরনের ব্রাহ্মণরাই যোগ্য অধিকারী রূপে পরিগণিত হত, যারা স্বাভাবিকভাবে মধুর কণ্ঠস্বরের সাথে উত্তম গায়ক, উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ, উত্তম বাদ্যকার এবং উত্তম পরিচালক ছিলেন। তাদের বেদের জ্ঞান পরিপক্ক এবং বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষ হতে হবে এটাই ছিল দস্তুর। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও তাদের জন্য মৌখিক ভাবে বৈদিক জ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করাও ছিল বাধ্যতামূলক, যে কারণে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সঙ্গীতের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হত। এই শিক্ষা পিতার দ্বারা পুত্রকে, গুরুদ্বারা শিষ্যকে বা গুরুকুলে বিদ্যার্থীদের সম্মিলিতভাবে দেওয়া হত। বৈদিক নীতি অধ্যয়নের জন্য কিছু আশ্রমের সাম পরিষদও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে সঙ্গীতের স্বর এবং ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান দেওয়া হত। এই নিয়মবদ্ধ বৈদিক সঙ্গীতকে বৈদিক যুগের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রূপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

লৌকিক সঙ্গীতের প্রেক্ষাপটে, অথর্ববেদ বীর পুরুষদের দ্বারা স্তুতিপরক লোকগাথা রাজাদের প্রশংসায় গান রূপে প্রচার করেছিল। যেমন - গাথা-নারাশংসী-রৈভ্য নামক স্তুতিপরক মন্ত্র, যা ধর্মীয় এবং লৌকিক উভয় অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হত।

অথর্ববেদ বৈদিক যুগের শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক সঙ্গীতের ভূমিকাও প্রদান করে। দ্বিতীয় কাণ্ডের দ্বাদশ সূক্তে যেমন বলা হয়েছে, সাম গানকারীরা তিনটি স্তবকের আশিটি মন্ত্র গায় -

“অশীতিভিস্তিস্তিঃ সামগেভিরাদিত্যেভিস্তিস্তিরগিরোভিঃ।

ইষ্টাপূর্তমবতু নঃ পিতৃণামামুং দদে হরসা দৈব্যেন।।”^{১৮}

অর্থাৎ, তিনটি স্তবকের আশিটি মন্ত্রের সাম গায়ক ঋষি অঙ্গিরা, দ্বাদশ সূর্য, আটটি বসু ও রুদ্র এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞ-উপাসনাদি কর্মের পূণ্য প্রতাপ আমাদের রক্ষা করুক। আমরা অভিচার কর্মের আকারে দৈবকোপের দ্বারা আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করি।

ভিন্ন একটি মন্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তবগান গাওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

“অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সতিষ্মণঃ।

পিঙ্গা পরি চনিরুদদিদ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্।।”^{১৯}

অর্থাৎ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণের সময় যুদ্ধের বাদ্যযন্ত্রের শব্দ হয়, সর্বত্র গুরু গুরু শব্দ করে, এবং গোলাপী ধনুকের প্রত্যঙ্গর শব্দের মতো শব্দ সর্বত্র উৎসারিত হয়। এইরকম ভাবেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তোত্র গাওয়া উচিত।

অতএব আমরা বলতে পারি যে অথর্ববেদের সময়েকালে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কলাত্মক এবং শাস্ত্রামক উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ প্রচলিত ছিল। সেই প্রশিক্ষণের পরিচয় হল যে আমাদের কাছে এখনও সেই সাম মন্ত্রগুলি উপলব্ধ রয়েছে। একই সময়ে অথর্ববেদ গন্ধর্ব এবং অঙ্গরাদের দেবত্বকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে। এই প্রজাতিগুলি সর্বদা নৃত্য এবং সঙ্গীতে জড়িত বলে জানা যায়।

অথর্ববেদে বাদ্যকলা : বৈদিক সঙ্গীতের দিকে এক নজরে দেখলে বোঝা যায় যে তৎকালীন সময়ে গান গাওয়ার একটি প্রধানতা রয়েছে। আবার সেখানকার প্রাপ্ত উপাদানসমূহ আমাদের সেই সময়ের বাদ্যযন্ত্রগুলির সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে। বৈদিক যুগে চার ধরনের বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে - ১. তন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র, ২. সুষির বাদ্যযন্ত্র, ৩. চর্ম আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, ৪. ধাতু দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। পরবর্তীকালে এই চার ধরনের বাদ্যযন্ত্র যথাক্রমে তত বাদ্য, সুষির বাদ্য, অবনদ্ধ বাদ্য এবং ঘন বাদ্য নামে পরিচিত বলে আমরা জানতে পারি।

অথর্ববৈদিক যুগে তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে ছিল। অনেক ধরনের বীণা ছিল। যেমন - বাণ বীণা, কর্করী বীণা, কাণ্ড বীণা, অপঘাটলিকা বীণা, গোধা বীণা ইত্যাদি। বাণ বীণাকে মহা বীণাও বলা হয়ে থাকে। এই বীণার সাথে একশটি তার সংযুক্ত থাকত। মহাব্রত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই বীণা কাষ্ঠদন্ডের দ্বারা বাজানো হত। বাঁশির ক্ষেত্রে তূণব নামটি ব্যবহৃত হত। চর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে দুন্দুভি এবং মৃত্তিকা নির্মিত দুন্দুভির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। দুন্দুভি হল এক বিশেষ ধরনের ঢোল যা চামড়া দিয়ে আবৃত এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, যা লাঠি দিয়ে বাজানো হত, যাকে আহননম্ বলা হয়ে থাকে। মাটির খন্ডে গর্ত খুঁড়ে চামড়া দিয়ে ঢেকে মৃত্তিকা দুন্দুভি তৈরি করা হত। এটি ষাঁড়ের লেজ দিয়ে বাজানো হত। পণব, পিঙ্গা, গোধা, পটহ, গর্গরাদি সকল বাদ্যযন্ত্রগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ধাতুর তৈরি বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে আঘাট নামক বাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, এটিকে অপঘাটলিক বা কাণ্ডবীণাও বলা হয়ে থাকে।

অথর্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডের ত্রিশতম মন্ত্রে তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে কর্করী বীণা এবং ধাতুর তৈরি বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে আঘাট বীণার উল্লেখ রয়েছে -

“যত্র বঃ প্রেজ্জা হরিতা অর্জুনা উতয়ত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি।

তৎ পরোতাপ্রসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন্।।”^{২০}

অর্থাৎ, যেখানে (মানুষের বাসস্থান) সবুজ ও কৃষ্ণ বর্ণের বৃক্ষগুলি আমোদ-প্রমোদবশত কম্পিত হচ্ছে, যেখানে নৃত্যের জন্য শব্দকারী ককরী এবং একটি আঘাট বীণা রাখা আছে। হে অঙ্গরা! সেখানে তোমরা তোমাদের স্থানে যাও এবং নিশ্চেষ্ট হও।

অন্য একটি মন্ত্রে চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে গর্গর, গোধা, পিঙ্গাদির প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় –

“অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সতিষ্মণং।

পিঙ্গা পরি চনিষ্কদদিদ্ভায় ব্রহ্মোদ্যতম্।।”^{২২}

এছাড়াও ২০তম কাণ্ডের ১৩২তম সূক্তের কিছু মন্ত্রে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন –

“ক এষা ককরী লিখং।

ক এষা দুন্দুভি হনং।

যদীয়ং হনং কথং হনং।।”^{২৩}

এখানে ‘ইয়ং’ শব্দটির দ্বারা দুন্দুভির বোধ হয়। অথর্ববেদে দুন্দুভি নামক বাদ্যযন্ত্রটি সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। এখানে দুন্দুভিকে আর্যদের দ্বারা পূজিত একটি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে যদি কোনো সেনাবাহিনীর সেনার থেকে দুন্দুভি চুরি হয়ে যায়, তাহলে তা সেই সেনাবাহিনীর পরাজয় হিসেবে বিবেচিত হত।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে বলা যেতে পারে যে রসের অনুভূতি আনন্দদায়ক, মন তা উপভোগ করার সময় আত্মমগ্ন হয়ে ওঠে। এর প্রভাব মন ও মস্তিষ্ক উভয়ের উপরেই পড়ে থাকে। ধ্বনির দ্বারা উৎপন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিই শব্দের উৎস। অর্থাৎ কণ্ঠ হতে কম্পন উৎপন্ন হয়, কম্পন থেকে আবার শব্দ আসে এবং তারপর শব্দ থেকে সৌন্দর্য তৈরি হয় আবার শব্দের অর্থগুলি তার পৃষ্ঠে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দের সত্তা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভৌতিক আনন্দের অনুভূতি অনুভূত হয়, কিন্তু যখন একটি স্বর জন্ম নেয় তখন আধ্যাত্মিক উন্নতির আনন্দের অনুভূতি হয়ে থাকে। এই আধ্যাত্মিক আনন্দই হল সত্য, শিব এবং সুন্দর।

Reference:

১. সঙ্গীত রত্নাকর, ছন্দ - ২১
২. অথর্ববেদ - ১১/৮/২৪
৩. অথর্ববেদ - ১২/২/২২
৪. অথর্ববেদ - ১২/১/৪১
৫. অথর্ববেদ - ৮/৬/১০
৬. অথর্ববেদ - ৫/২০/১০
৭. অথর্ববেদ - ৮/৬/১১
৮. পদ্ম পুরান, উত্তরকাণ্ড - ১২/২১
৯. অথর্ববেদ - ২/১২/৪
১০. অথর্ববেদ - ২০/৯২/৬
১১. অথর্ববেদ - ৪/৩৭/৫
১২. অথর্ববেদ - ২০/৯২/৬
১৩. অথর্ববেদ - ২০/১৩২/৮, ৯, ১০